সময় গুনবে ম্যাডাম, ওটা ভাল সময় দেয়। এক সেকেন্ডের একশত ভাগের এক ভাগও মাপা যায়। হাসছে রেজা। হাসতে হাসতে বললো—এর সাথে একটা মোবাইলও দেব। আমিও নেব একটা।

কেন আমাকে চাঁদে পাঠাবে না কী? তিষির কণ্ঠে সত্যিকারের বিস্ময়।

না, না, না, চাঁদে যেতে হলে তো মোবাইলের পরিবর্তে স্যাটেলাইটের কথা বলতাম কিংবা রকেট। বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ালো রেজা।

সে কী? মোবাইল দিয়ে ঈদ করবে নাকি? বাচ্চাদের জামাকাপড় কিনতে হবে না? তিষির বিস্ময়ের মাত্রা বাড়লো।

ঈদ, বাচ্চাদের! রেজা রীতিমতো অবাক? বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়তে নাড়তে বললো—ঈদ, তা পরে হলেও চলবে। শোন, আমি যখন বাসা থেকে কোন কাজে বেরুব, তুমি স্টপ ওয়াচ অন করবে। দশ মিনিট পরপর মোবাইলে যোগাযোগ করবে আমার লোকেশন নেবে। তা হলে তুমি দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হতে পারবে। ইয়েস, মাই ডিয়ার ওয়াইফ, ইয়েস, ইয়েস। ইট্‌স এ ভেরি গুড আইডিয়া।

ছায়া হি হি করে হাসছে। ঠিক দুলাভাই—আমার প্রিয় আপামনি এবার শান্তিতে বাসায় বসে পান জর্দা ধ্বংস করতে পারবে। সাথে সাথে তার দিলও ঠাণ্ডা হবে। হতে পারে দু'একটা গান টানও শুনবে। হাসতে হাসতে বললো ছায়া।

ছায়ার দিকে ফিরে একটা প্রাণকাড়া হাসি দিলো রেজা। বললো—তাই নাকি রে ছোট? তোর আপা আবার গান শুনে নাকি?

শুধু কি শুনে, মেজাজ-মর্জি ভাল থাকলে গলা ছেড়ে গায়ও। ছায়া হাসলো হি হি করে।

রেজা আঁতকে উঠলো বললো—বিলকিস! একটু আগে যে ভাষায় গাইলো, সেই ভাষায়? প্রতিবেশীরা তো তাহলে পালাবে!

ছায়া হাসির মাঝে গাম্ভীর্য ফিরিয়ে আনলো। বললো—আবার আন্ডার এস্টিমেট করছো। অনেক গল্প শুনেছি তোমার। আপুর গান শুনেই নাকি দেওয়ানা হয়েছিলে!

এবার গাম্ভীর্যে ভাটা পড়ল তিষির মুখে। বললো—তোমরা থামবে?

রেজার দিকে ফিরে বললো— যাও, গোসল করে ফ্রেশ হয়ে নাও। তবে মোবাইলের আইডিয়াটা মন্দ না। মুচকি মুচকি হাসছে তিষি।

রেজা বাম হাতে শার্টটা দোলাতে দোলাতে নিশ্চিত মনে প্রস্থান করছে। ছায়া দোয়েলের দিকে ফিরে বললো—দুলাভাই, গালি খেয়ে ধীরে ধীরে গোল হয়ে যাচ্ছে।

নাচের ভঙ্গিতে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলো রেজা। বললো—নো, নো মাই ডিয়ার। গালি খেতে খেতে আমি গালি-প্রুফ ডিনামাইট হয়ে গেছি। ফাটলে ফুলের সুগন্ধ ছড়াবে।

পিতার প্রস্থানের পর দোয়েল বইটা নামিয়ে রাখলো বুকে। ছায়ার চোখে চোখ রেখে একটু হাসলো! বললো—বেচারা!

কান্না

শুনেছি কুমিল্লায় ওরা নিষ্ঠুরের মতো মেরেছে। সব বাঙালি সৈনিককে মেশিনগানের মুখে দাঁড় করিয়ে হত্যা করেছে এক সাথে। আমি যেন দিব্য দেখতে পাচ্ছি, গুলির আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন, রক্তাক্ত। নরঘাতকের উল্লাসের মাঝে ওর দেহ নিশ্চল হয়ে গেলো। বলতে বলতে ডুকরে কেঁদে উঠলো রাখি। বললো—না, নেই। তোর দুলাভাই আর নেই! হু হু করে কাঁদছে রাখি। ছোট ছোট চারটে বাচ্চা এতিম হয়ে গেলো! এখন আমি কি করবো! অস্থির ভাবে বারবার চোখ মোছে ও।

একাত্তরের এপ্রিল মাস। যুদ্ধ শুরু হয়েছে সপ্তাহ তিনেক। এখনও ধাক্কা সামলে উঠতে পারেনি অনেকেই। কি নৃশংস বর্বরতা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর! দাউ দাউ করে জ্বলছে নগর, বন্দর, জনপদ! নিরস্ত্র যুবা, বৃদ্ধ কিংবা শিশু অসহায়ের মতো মরছে ওদের জিঘাংসার তপ্ত বুলেটে। হিংস্র হায়েনার চোখেমুখে দানবের উল্লাস। নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ক্লান্ত মানুষের ঢল নেমেছে গঞ্জ আর জনপদে। স্রোতের মতো এখনো সে ঢল অব্যাহত।

দ্রুত দানা বাঁধছে সংগ্রামী চেতনা। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ডাক আর কালুরঘাট ব্রিজের বেতার কেন্দ্র দ্রুত মুক্তিযুদ্ধকে সংঘবদ্ধ করছে। বিন্দু থেকে উত্থান শুরু হলো মুক্তিবাহিনীর। দলে দলে ভিড়লো মুস্তাফিজ, হারুন, হাসান, জগলুল, মোতালেব ও মশিউর। কোন প্রশিক্ষণ নেই লড়াইয়ের। কিন্তু সীমাহীন দেশপ্রেম আর পাহাড় সমান মনোবল সংগঠিত করে চলেছে মুক্তিবাহিনীকে, শুরু হয় প্রতিরোধ যুদ্ধ। পাকিস্তানি দানবীয় শক্তিকে রুখে দাঁড়লো ওরা অমিত তেজে। প্রথমে রামদা, বল্লম, লাঠি ও পরে কিছু থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল। গ্রাম্য মাতব্বরদের কাছে থেকে কিছু বন্দুকও হাতে এলো। কিন্তু তাও তো কম নয়। ওদের মনোবল বাড়াতে যোগ হলো আর এক মাইল ফলক।

এখন আর পালানো নয়। হয় মার, নয় হয় মর। শুরু হলো লড়াই। অসম অস্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। গ্রামের কৃষক, স্কুল-কলেজের ছাত্র, চাকরিজীবী, বিভিন্ন পেশাজীবী, বাঙালি সৈনিক, দলছুট কিছু বিডিআর, পুলিশ, আনসার হাসিমুখে আত্মাহুতির গনগনে আগুনের দিকে জোর কদমে এগিয়ে গেলো। কোন পিছুটানই তাদের বাধা হয়ে দাঁড়ালো না। মায়ের স্নেহ, সন্তানের ভালবাসা, কিংবা প্রেয়সীর অনিন্দ্য সুন্দর মুখ গৌণ হয়ে গেলো দেশপ্রেমের কাছে। এদেশ আমার। এদেশ আমার ভালবাসা। এদেশ সমগ্র বাঙালির। এ আমার অহংকার। দানবের হিংস্র নখর হতে একে বাঁচাতেই হবে। এখানে কোন কিন্তু নেই, কোন প্রশ্ন নেই। আছে শুধু প্রত্যয় আর স্বদেশের প্রতি বুকভরা গভীর মমত্ববোধ। যে গ্রেনেডের কথা শুনলে ওরা এক সময় আঁতকে উঠত, সেই গ্রেনেড এখন ওদের কাছে ছেলেবেলায় ঘর পালিয়ে মার্বেল খেলার মতো অতি সাধারণ। গাছ থেকে পেড়ে আনা সবুজ পেয়ারা যেন! রাতের অন্ধকারে শত্রুর বাংকারে ছুঁড়ে মারায় ওদের মনে এখন খেলে যায় এক ধরনের ঘোরলাগা আনন্দ।

ওরা আত্মাহুতি দিলো অগণিত। বেহিসাবে শহীদ হলো কায়সার, ফারুক, রহমত, জিন্দার। গ্রামে-গঞ্জে এখানে সেখানে শহীদের সমাধিস্থল। অসাধারণ হবার সুযোগ পেল না অনেকেই। কোন কোনটি আবার নামহীন, গন্ধহীন হয়ে হারিয়ে ফেলতে লাগলো নিজের আত্মাহুতি আর গৌরবের ইতিকথা। ওরা জানে হারানোতেও সুখ, যা করেছে শুধু মায়ের বন্দিত্বের শৃঙ্খল ভাঙতে করেছে। না হয় না-ই বা জানুক লোকে কিন্তু ওতো সাধ্যমতো দিয়েছে ওর সব, যা কিছু আছে, প্রাণটুকু সহ।

দিন গড়ালো এবং মাস। এগিয়ে চলল মুক্তিযুদ্ধ। হানাদার হায়েনারা এখন শংকিত। পলে পলে মার খাচ্ছে তারা। একজন তো মরতে মরতে বলেই গেলো—নেহি সমঝোতা, বাঙাল আদমিকো এইসা ছোট সিনা মে এতনা বড়া দিল হ্যায়। এ ওয়াতন তো শেরকা ওয়াতন নিকলা। কাজী বাড়ির কাজের ছেলে মস্ত জোয়ান। বেয়নেটের শেষ খোঁচায় ওকে ধরাশায়ী করতে করতে বললো—বোঝছ হালা, তয় অনেক পরে। এহানে হান্দানোর আগে আন্দাজ পাও নাই, এহন বোঝ কারে কয় বাঙালির মাইর!

ধীরে ধীরে হানাদারদের ক্ষমতার বলয় কমে আসতে শুরু করলো। দূর-দূরান্তের থানা ও শহর থেকে তাদের অবস্থান গুটাতে শুরু করেছে একে একে। একুশে নভেম্বর ওদের জন্য বয়ে আনলো আর এক অশনি সংকেত। এ যেন মরার উপর খাঁড়ার ঘা। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী সংগঠিত হয়েছে। অকুতোভয়, ওরা পরিকল্পিত ভাবে এবার আক্রমণে আসছে। দূরন্ত তরুণদের মাঝেও পড়ে গেলো বিপুল সাড়া। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ওদের সশস্ত্র বাহিনী, ওদেরই অংশ হতে। একের পর এক পরাজয়ের খবরে নাভিশ্বাস উঠলো টিক্কা খানের। এক সময় হাল ছেড়ে কেটে পড়ল নিঃশব্দে। এলো আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী।

নির্মম ভাবে ওরা শেষ কামড় দিলো বাঙালি জাতির ওপর। স্থানীয় দোসর আল বদর আর রাজাকারের সহায়তায় বাঙালি কৃতি সন্তানদের চোখ বেঁধে ধরে হত্যা করা শুরু করলো। অকারণে বধ্যভূমি ভরে গেল অনেক মুনীর চৌধুরী আর শহীদুল্লাহ কায়সারের লাশে! চারদিকে আতঙ্ক! হায়েনাদের অপরিণামদর্শী শেষ ছোবল এ জাতির ওপর। ওরা এ জাতিকে অনাথ আর পঙ্গু করে ফেলতে চায়। কিন্তু নির্বোধেরা কি জানে, যে জাতি একবার তাঁর ক্ষণজন্মা বীর সন্তানদের জন্ম দিতে পেরেছে, প্রয়োজনে বারবার জন্ম দেবে। এভাবে হয়তো একটা সময়কে স্থবির করে দেয়া যায় কিন্তু অনাগত ভবিষ্যৎকে কি পঙ্গু করা যায়?

ডিসেম্বরর শুরু থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মিত্রবাহিনীর আক্রমণে দিশেহারা হিংস্র হানাদার বাহিনী। ওদের মধ্যে বিশৃংখলার চূড়ান্ত আর বাংলার পথঘাট বন্ধনহীন মুক্তিযোদ্ধার পদভারে প্রকম্পিত। যে দেশে মুস্তাফিজ, নাসিম, কায়সার, কিংবা বাকীর মতো ছেলে আছে, সেখানে ওরা থাকবে কী করে? অপরিণামদর্শী অপশক্তির পলায়নের পরিসমাপ্তি ঘটলো ষোলই ডিসেম্বর রেসকোর্সে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে। মাথা নিচু করে পরাজয়ের চুক্তিপত্রে সই করলেন জেনারল নিয়াজী তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে।

দেশে এখন বিজয়ের মিছিল। ঘরে-ফেরা মানুষের আনন্দ আর কান্নার মিছিল। ন'মাস আগে ফেলে যাওয়া নিজের আবাসে ফিরছে জমিলা নতুন আশায় ঘর বাঁধবে বলে। কিন্তু ঘর কই, এতো একটা কয়লার স্তূপ! পুড়ে ছাই করে রেখে গেছে দানবেরা। পাশে দাঁড়ানো দু'টো কাঁঠাল আর একটা আম গাছে আর কোনদিন ফল ধরবে না।

তবু জমিলা আনন্দে হেসে ওঠে। কি ভাবছিস তোরা, এই ভাবে দমাবি? পারবি না, পারবি না। আবার ঘর উঠামু। আবার নতুন কইরা বাঁচুম। আবার গাছ লাগামু। হা হা করে হাসছে জমিলা আর তার দু'চোখ বেয়ে গড়াচ্ছে দুঃখ-ভুলানিয়া শ্রাবণের শেষ বর্ষণের মতো অশ্রু। তারপর গড়িয়েছে মাস, বছর। আমি চাকরি করি কুমিল্লায়। বদলি হয়ে এসেছি সাত মাসের মতো। রাখি আমার বড় বোন। ছেলেবেলা মা'র অসুখ থাকায় ওর কোলে পিঠে মানুষ হয়েছি। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়েছে দু'যুগেরও বেশি। অনেক পরিবর্তন হয়েছে আমাদের। আমরা এখন এক মুক্ত স্বাধীন জাতি। আমাদের সিদ্ধান্ত আমরাই, আমাদেরই। সেখানে কারো অনাকাঙ্ক্ষিত উপস্থিতি বরদাশত করি না।

কিন্তু রাখির জীবনের কোন পরিবর্তন হয়নি। চার-চারটে সন্তান আর শহীদ পরিবারের সিল পিঠে নিয়ে বেঁচে আছে। বাচ্চারা বড় হয়েছে। তবে তেমন একটা লেখাপড়া শিখেনি কেউ। পিতা ছাড়া অনটনের সংসার হলো হাল ছাড়া নৌকার মতো। এরাও স্রোতের টানে টানে ভেসে এসেছে বহুদূর। সেই নৌকার কাণ্ডারি রাখি। হাল ছাড়েনি কোনদিন।

বলেছিলাম—তোকে সরকারও দেখছে না, সমাজও দেখছে না, একটা বিয়ে করে ফেল। ম্লান হেসে জবাব দিয়েছে—বিয়ে একবারই করেছি। তোর দুলাভাইয়ের স্মৃতি বুকে ধরে আর সন্তান লালন পালন করে বাকি ক'টা দিন কাটিয়ে দিতে পারবো। বড় ছেলে একটা চাকরি করে। তার পাঠান কিছু টাকা আর যৎসামান্য সরকারি সাহায্যে ও ধুকে ধুকে টিকে আছে।

সেবার রাখি কুমিল্লায় এলো ওর ছোট মেয়ে কেয়াকে সঙ্গে নিয়ে। বয়স আর অভাবের সাক্ষী বহন করছে ওর চোখে মুখে। বললাম—পথে কোন কষ্ট হয়নি তো?

ম্লান হেসে বললো— আমাদের আবার কষ্ট। কষ্টের সাগরে ভাসছি, ছোট খাট অসুবিধা আর হিসেবে আনি না।

এককালে রাখি ভাল গাইতো। বললো—ঐ গানটা শুনিস নি, সাগরে তুমি যার পেতেছ শয্যা, শিশিরে তারে আর দেবে কি লজ্জা।

ওর দিকে তাকিয়ে কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললাম—শুনেছি। বলে অন্য কাজের বাহানায় ওর চোখের সামনে থেকে পালিয়ে গেলাম।

বিকেলে রাখি বললো—চল, এখানকার সেনানিবাসটা দেখে আসি।

বললাম—তুমি কী দুলাভাইয়ের স্মৃতি খুঁজবে! এতোদিনে সব বিলীন হয়ে গেছে না?

রাখি হ্যাঁ বা না কিছু বললো না। কিন্তু দেখলাম ওর মুখে আমার অচেনা একটা ক্লান্ত হাসি লেপ্টে আছে।

বিকেলে টিপরা বাজারের পাশ দিয়ে বাজারে ঢুকলাম। আমি একা একটা রিকসায়। রাখি আর কেয়া আমার পিছনে অন্য একটায়। কর্তব্যরত মিলিটারি পুলিশের কাছে জানতে চাইলাম একাত্তরের শহীদ স্মৃতি কোনখানে সংরক্ষিত। হাত তুলে ঈঙ্গিত করলো সহৃদয় অল্পবয়সী মিলিটারি পুলিশ। বললো—ঐতো দাঁড়িয়ে আছে 'যাদের রক্তে মুক্ত স্বদেশ'।

তার হাত অনুসরণ করে তাকাতেই দেখি অদূরেই সবুজ ঘাসে ঢাকা ঝকঝকে চত্বরে সুন্দর সিরামিক ইটের তৈরি মনোরম স্মৃতিসৌধ। আমি রাখির হাত ধরে এগুতে চাইলে ও থমথমে গলায় বললো— এবার তোর নয়, আমি কেয়ার হাত ধরবো। কেয়া ওর মেয়ে যাকে একুশ দিনের রেখে দুলাভাই কুমিল্লায় এসেছিলেন।

আমি রাখির পিছনে, ও এগিয়ে গেলো। বাম হাতে শক্ত করে কেয়াকে ধরে রেখেছে! স্মৃতি ফলকে লেখা প্রথম লাইনটা ও পড়লো, ওহে পথিক বলো ওদের গিয়ে, মাতৃভূমির সম্মানে ..... আর পড়তে পারলো না। দেখলাম থরথর করে কাঁপছে রাখি। কেয়া ওকে সামলানোর চেষ্টা করছে। চোখ মুছে ও বাকি অংশটুকু পড়া শেষ করলো—শহীদ আমরা। হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো রাখি। বললো—তুমি এখানে একা কতকাল ধরে শুয়ে আছ! জানি তোমার বড্ড কষ্ট কিন্তু আমি কি করতে পারি! এই তোমার ছোট মেয়ে কেয়া, তোমাকে দেখাব বলে ওকে নিয়ে এসেছি। দেখ তুমি, দেখ কত বড় হয়েছে ও। আমি ওদের আগলে আগলে রেখেছি, কিন্তু আর পারি না।

রাখির বিলাপ শহীদ মিনার এলাকার বাতাসকে ভারি করে তুললো। বললো—আমি এবার অবসর চাই, তোমার কাছে আমাকে একটু ঠাঁই দেবে! বলতে বলতে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লো রাখি।

কেয়া বসে আদর করে ওর মাথাটা কোলে তুলে নিলো। তারপর সৌধের দিকে তাকিয়ে বললো—বাবা, তোমাকে কোনদিন দেখিনি! তবে তোমার ছবি আঁকা আছে আমার বুকে। আমি জানি তুমি দেখতে কেমন। দেখা হলে নিশ্চয়ই খুব আদর করতে! আমাদের ছাড়া তোমার খুব কষ্ট তাই না বাবা! মা'র সাথে ঝরঝরে করে কাঁদতে শুরু করলো কেয়া।

সূর্য পাটে বসেছে। রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। ধীরে ধীরে লাল আভা আরো লাল হলো। মনে হলো দুলাভাইয়ের বুকের ফিনকি দেয়া রক্ত চারদিকে পড়েছে পৃথিবীটাকে রঙের খেলায় ভরিয়ে দিতে। দূরে ঘুঘু ডাকছে থেমে। আরো দূরে একটা কোকিল ডাকলো কু-উ। শহীদ স্মৃতি'র চত্বরে কিছু ফুল ফুটেছে। হালকা বাতাসে নড়ছে মৃদুমৃদু। আমার মনে হলো ফুলের চোখ দিয়ে দুলাভাই তাঁর স্ত্রী আর মেয়েকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছেন। তাঁর চোখেও কি এখন অমন বাঁধভাঙ্গা কান্না।

আমি স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে। হঠাৎ কম্পিত বাতাসে তৃতীয় কার কান্নার শব্দ পেলাম।

[আমাকে রচনা লিখতে বলা হলো। লিখতে বসলাম এবং লিখতে লিখতে আমার নিতান্ত প্রিয় গণ্ডির কিছু বেদনামূর্ত মুহূর্ত কখন যে কলমের আঁচড়ে মূর্ত হয়ে উঠলো বুঝতে পারি নি। যাদের নিয়ে এ গল্প তাদের হৃদয়ও কী সত্যি সত্যি আমার মতো বেদনায় আর্ত হয়ে উঠবে!]

এই দিন সেই দিন

হ্যালো।

খসরু ভাই?

কী হয়েছে মাসুদ?

অস্থির গলায় মাসুদ তার বড় ভগ্নিপতিকে বললো—আব্বা যেন কেমন করছে আপনি একটু তাড়াতাড়ি আসেন।

রাত এগারোটার টেলিফোনের শব্দে ছুটে এলো শর্মি। স্বামীকে বললো—কার টেলিফোন? কার সাথে কথা বলছো?

মুখে আঙুল তুলে চুপ করার জন্য ইঙ্গিত করলো খসরু।

কখন থেকে এ অবস্থা, বলো তো? জিজ্ঞেস করলো মাসুদকে

ওপারের উত্তর শোনার আগেই শর্মি হুমড়ি খেয়ে পড়লো। হাউমাউ করে কান্না শুরু করলো সে। বললো—আব্বা নেই, নিশ্চয়ই তুমি মাসুদের সাথে কথা বলছো।

খসরু টেলিফোনের স্পিকার ডান হাত দিয়ে চেপে ধরে নরম চোখে তাকালো স্ত্রীর দিকে।

বললো—এখনও কিছু হয়নি, মাসুদের সাথে কথা শেষ করতে দাও। আবার টেলিফোনে কথা শুরু করলো খসরু। কী বললে? খালা আম্মা ইনজেকশন দিয়েছে, একবারে দু'টো। আচ্ছা ঠিক আছে, ব্লাড প্রেসার এখন কত?

ওপার হতে ভীত কণ্ঠ ভেসে এলো মাসুদের। খালা আম্মা অনেকক্ষণ ধরে মাপার চেষ্টা করছেন, আমাদের কিছু বলছেন না।

বুক কী উঠানামা করছে? না হয় নাকের কাছে তুলা ধর, দেখ তুলা নড়ে কিনা। কণ্ঠ সংযত করে প্রশ্ন করলো খসরু।

মাসুদের ভীত কণ্ঠ শোনা গেল ফোনে। বললো—খসরু ভাই, কোন নড়াচড়া বোঝা যায় না।

শর্মি আবার হাউমাউ করে কান্না শুরু করেছে। ছেলে মেয়ে দু'টো মা'র দু'পাশে এসে দাঁড়ালো।

খসরু টেলিফোন রেখে স্ত্রী'র দিকে ফিরে বললো—মনে হয় আমাদের যাওয়া উচিত। ওরা কেউ অবস্থা বুঝতে পারছে না। মেয়ে কান্তাকে বললো—তোর মা'র কাপড়গুলো দে, কি জানি রাতে যদি থাকতে হয়। আর তোরাও সাথে কিছু নিয়ে নে।

ওরা সবাই হুড়োহুড়ি করে কাপড় সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস গোছাচ্ছে। খসরু টেলিফোন তুলে অফিসে ডায়াল করলো। তার পরিচিত ড্রাইভার নজরুলকে